



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1043 - 1053

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্রনাথের শৈশবশিক্ষার রূপ ও বিকাশ

ড. তুষার পটুয়া

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: patua.tushar@gmail.com

ORCID ID 0009-0009-9725-8019

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Indigenous education, textbooks and the contemporary education system, early childhood education, the role of private tutors, the foundation of Rabindranath Tagore's educational philosophy.

Abstract

Rabindranath was a man who, instead of believing in and adhering to the conventional education system of Bangladesh, distanced himself from it with disdain; yet, he became known to the entire world as a poet, essayist, novelist, playwright, educationist, and much more. From early childhood education to any form of national education, Rabindranath's educational philosophy and vision are the primary foundation. His invigorating educational principles have gained acceptance worldwide. The establishment of Visva-Bharati, emphasizing indigenous educational methods in contrast to Western educational systems, is one of Rabindranath's greatest achievements. His essays on education are vibrant with discussions on our duties, rights, the form of eternal ideals, and the search for a new form of social responsibility. The processes of learning and teaching, the contributions of teachers in the educational tradition, and the purpose of education were all remarkably clear and specific to Rabindranath. The primary objective of education is the perfection of 'humanity'. He has placed the teachers he received in his childhood at the heart of this endeavor called education.

Discussion

“যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাৱশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাৱশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।”^১

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বের অন্যতম শিক্ষাবিদ। পিতৃদেৱের পরিশীলিত রুচিবোধ, সাংস্কৃতিক আদর্শ ও ঐতিহ্য, কুসংস্কারমুক্ত মানসিকতা বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল ‘হয়ে ওঠা’-র উপযুক্ত ভিত্তিভূমি। আশৈশব কল্পনাপ্রবণ মন ও মুক্তিপথের অনুসন্ধানী আধ্যাত্মিক মনের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সমকালের শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষাবিধি, পাঠদানের পদ্ধতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই বাল্যকালের স্বল্পস্থায়ী বিদ্যালয় জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল ভয়ংকরভাবে দুঃখজনক।

আমাদের দেশের শিশুদের শিক্ষাপ্রদানের নামে যে জবরদখল করার মানসিকতা প্রচলিত, তার থেকে শিক্ষাপ্রবণতার দুর্বৃত্তপোষণ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সহজেই। কবি তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু স্বশিক্ষায় শিক্ষিত কবিমণি একটি বিশ্বজনীন শিক্ষাদর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সমকালের সেই ব্যবস্থাপনার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। প্রতিবাদের সুরে বলেছেন, বাল্যকাল থেকে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের দূর দূর পর্যন্ত কোনও সম্পর্ক থাকে না। আমরা বিকাশলাভ করি; আবার আমাদের কাজ কোনোক্রমে চলে যায়; কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই হয়ে ওঠে না। বাল্যকাল থেকে শিক্ষার ধরনটি (চিন্তা ও কল্পনার চর্চা) না করলে বড়ো হয়ে কাজের সময় আর মনে আসে না। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সেই প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে আছে। লাভজনক ব্যবসার পণ্য হিসেবে উপস্থাপিত শিক্ষাকে আমরা কতখানি বাহন করে নিতে সক্ষম হয়েছি সে ব্যাপারে বিস্তারিত সন্দেহ আছে।

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কথা হল শিক্ষা শুধু দেওয়া-নেওয়ার বিষয় নয়; তা আপন মনে আপন তগিদে গ্রহণ করার বিষয়। মানুষের একটি স্বাভাবিক চাহিদা থাকে, যেখানে সে তার ভালো লাগা, না লাগা বা পছন্দ ও অপছন্দ সবই নিজের মতো করেই প্রকাশ করে। প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষের নিজের একটি স্বাভাবিক বা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। জীবনের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মূল ধর্মই তো তাই— ‘আত্মবিকাশের পথ আবিষ্কার করা।’ জন্মজন্মান্তরে এই ধারার শেষ নেই। প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষ নিজের ইচ্ছাপূরণ-মানসকল্পে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে নিরন্তর। মানবের পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী বেড়ে ওঠার সুযোগ ও উপযুক্ত পরিসর নির্মাণ করা বাধ্যতামূলক বিষয়। আমরা এইভাবে পৌঁছাতে পারি মহর্ষির ঠাকুরবাড়িতে।

শিশু বলতে আমরা বুঝি ৫ থেকে ১৬ বছরের সন্তানদের। এই সময়ের মধ্যেই শৈশবজীবন পরিব্যাপ্ত। এই সময় মানুষ তার জীবনে চলার পথের নানান পাঠ্যপুস্তক ও পাঠানুশীলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে যাত্রা করে থাকে। পাণ্ডিত্যভিমानी গুরুমশায়ের পরিবেষ্টনী ভেদ করে বা সেই বৃত্ত পরিভ্রমণ করে, বাইরে বেরিয়ে যাওয়া সেই কালে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে সহজ ছিল না। বিশেষ করে সংস্কৃতিবিশেষজ্ঞ দ্বারা আবৃত সংস্কৃতিসম্বল ঠাকুর পরিবারের মতো পরিবারগুলির মধ্যে তো ছিলই না। তবুও রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবর্তন পরিসরে সদাতৃপ্ত স্বচ্ছন্দবিহারী হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিসরে স্বজনবিদ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়েছিল মাঝে মধ্যে। স্বয়ং তড়িত স্বয়ং রচিত পদ্ধতির অবতারণা করে তিনি সরলীকৃত শিক্ষাগ্রহণ পর্বের যাত্রা শুরু করেন। তাঁর নিজের উদ্ভাবন সর্বক্ষেত্রেই আজকের দিনের গবেষণার থেকে কোনো অংশেই কম নয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদান— এই দুইদিক বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সরলীকৃত এই উদ্দিষ্ট দুইটি দিক মীমাংসাসাধ্য বিষয় নয়। পরিবারের অগ্রজদের কাছে আক্ষেপ ও দুষ্টান্তের বিষয় ছিল বালক রবীন্দ্রনাথের স্কুলবিমুখ মানসিকতার জন্য। স্কুলে না গেলে পড়াশুনা হয় না— এই দীর্ঘকালের প্রচলিত ধারণা থেকে সকলেই মনে করতেন শিশু রবির পড়াশুনা হবে না এবং এর প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। দুর্ভাগ্যে জর্জরিত শিশু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছিল অবহেলা অবজ্ঞায় এবং স্কুলজীবনের বাইরেই। এই বাইরে থাকার প্রবণতা তাঁকে অন্তরের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। অগ্রজদের সংসর্গে ভাগ্যক্রমে ‘নানা বিদ্যা’র চর্চার মধ্যে দিয়ে শৈশব শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল।

১

কলকাতায় অবস্থিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যখন ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে তখন মহর্ষি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণরত। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর পারিবারিক ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার ফলে মনের মধ্যে ‘বিরক্তি ও ঔদাস্য’-ভাব অতিশয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই তাঁর আত্মার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশের জন্যে ব্যগ্রতা অনুভব করতে শুরু হয়। তাই তিনি আত্মার মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানের রত ছিলেন প্রতিনিয়ত। একাগ্র চিন্তে ও কঠোর তপস্যার দ্বারা জীবনের প্রকৃত মানে উদ্ধারের রত থাকেন। তিনি উপলব্ধি করেন, “ন ধনেন ন

প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগে-নৈকেনামৃতত্বমানুঃ।” অর্থাৎ না ধন, না পুত্র, না কর্ম— এক ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, -

“আমি যখন জন্মেছি তখন থেকে তিনি হিমালয়ে ও দূরে দূরে ভ্রমণ করেছেন। দু-তিন বছর পর পর তিনি যখন বাড়ি আসতেন; তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তন অনুভব করতুম— সেটা আমার অল্প বয়সকে ভয়েতে সম্ভ্রমে অভিভূত করত। সেই আমার বালক-বয়সে তাঁর সত্তার যে মূর্তি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সে হচ্ছে তাঁর একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ।”^২

বাবাকে মাঝে মাঝে পেয়ে শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে— “বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ”। অর্থাৎ যিনি এক এবং অদ্বিতীয় তিনি এই মুক্ত আকাশে বৃক্ষের মতন স্তন্ধ হয়ে বিরাজমান।

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস না রেখে সেখান থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন; অথচ সেই মানুষটিই একদিন সারা বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, শিক্ষাবিদ ও নানাবিধ অভিধায়। আজকের দিনে শিশুশিক্ষা থেকে শুরু করে যে-কোনো জাতীয় শিক্ষার প্রধান অবলম্বন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাদর্শন। তাঁর সঞ্জীবনী শিক্ষামন্ত্র আজ পৃথিবীময় গ্রহণযোগ্য রূপ লাভ করেছে। পশ্চিমী শিক্ষাপদ্ধতির বিপ্রতীপে দেশজ শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বপ্রদান করতে গিয়ে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম মহৎ কীর্তি। আমাদের সীমাবদ্ধতা, কর্তব্য, অধিকার, চিরন্তন আদর্শের রূপ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার নবতর রূপের অনুসন্ধান মুখরিত হয়ে আছে উক্ত শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি। শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান, শিক্ষাপ্রদান পরস্পরায় শিক্ষকদের অবদান, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল ভীষণভাবে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় গলদ কীভাবে তৈরি হয়েছে তার ব্যাখ্যা করে সঠিক পথনির্দেশ করেছেন তিনি। বলাবাহুল্য শিক্ষার জন্যে এই মানুষটি সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এই মহান শিক্ষাবিদেবির নিজের ক্ষেত্রেই ছিল না কোনো প্রথাগত ডিগ্রি। ভাবতেও অবাক লাগে যে তিনি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন স্কুলবিমুখ বা স্কুল পালানো ছেলে। স্কুলবিমুখ হলেও বিদ্যাবিমুখ যে ছিলেন না, তার প্রমাণ আমরা এই সূত্রে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝতে পারব।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল মহর্ষির বিখ্যাত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে। তাঁর চিন্তাজগত, সৃষ্টানুভূতি ও সৃজনী শক্তির কেন্দ্রমূলেই ছিল মহর্ষির দ্বারা প্রবর্তিত শিক্ষা। বাংলাদেশের তথা কলকাতাকেন্দ্রিক যে নবযুগের উন্মাদনা শুরু হয়েছিল, তার কেন্দ্রে ছিল এই ঠাকুর পরিবার। অর্থাৎ উনিশশতকের নবজাগরণের উদ্ভাসিত আলোকের স্নাত এই পরিবারের সদস্যগণ। দেশে ও দেশের বাইরে এই পরিবারের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল শুধুই বিত্তের কারণে নয়; তার সংস্কৃতির কারণেও। বাড়ির পরিমণ্ডলটি কেমন ছিল তা ‘ভারতী’র পৃষ্ঠায় (বৈশাখ ১৩২১) বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি’ নামক রচনায় বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, -

“জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে একজন গুরুমশাই ছিলেন, তাঁহার নিকটই ইহার হাতে খড়ি হয়। সেই পাঠশালায় প্রতিবেশীদিগের অন্যান্য ছেলেরাও পড়িতে আসিত।”

গুরুমশায়ের বর্ণনায় যুক্ত হয়েছে— তাঁর মুখে কখনও হাসির রেখামাত্র দেখা মিলত না। রং ছিল কালো, চুল লম্বা মুখে কাঁচা পাকা দাড়িতে ভর্তি। শুধু ছাত্রদের বেত মারার সময় কিছুটা হাসির রেখা দেখতে পাওয়া যেত। সেটা অবশ্য মনে হয় হাতের সুখ অনুভব করেই। পড়ানোর সময় তিনি অর্ধ উলঙ্গ হয়ে পা ছড়িয়ে ‘গুরুচ্ছাদি’ তেল মর্দন করতেন। বেত্রাঘাত আর গালবর্ষণ তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা হিসেবেই ধরে নেওয়া হতো। বাইরের গুরুমশায়দের ছাড়াও পরিবারের হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (সেজদাদা) কাছে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের পড়তে হয়েছে কড়া শিক্ষানীতির মধ্যেই। মিছি মিছি সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে নানান বন্দবস্ত তাঁর বরাদ্দ ছিল। পাশাপাশি ‘ভূতরাজতত্ত্বের’ সমুদ্রাসিত আলোকে ভূত ও আত্মীয়দের কড়া শাসনে অতিবাহিত হয় বাল্যকালের সমাপ্রতি দিনগুলি। এই পরিমণ্ডলে একদিন যে বীজ রোপিত হয়েছিল তার শোভা পরবর্তীকালে প্রস্ফুটিত হয়েছিল।

২

ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল— উপনয়ন না হলে বিদ্যারস্ত্রের কথা উত্থাপিত হোত না। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলিতে এবং জাতকের কাহিনিতে উপনয়নের পূর্বে শিক্ষাগ্রহণের ইতিহাস খুব একটা পাওয়া যায় না। জাতকের কাহিনিতে গুরুগৃহে শিক্ষাগ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত আছে। মোটামুটি পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রামাণিক দলিল মেলেনি। ভাষাচর্চার কথা শোনা গেলেও শিক্ষাচর্চার ইতিহাস নেই। দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষাচর্চার প্রমাণ চর্চায় মেলে। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকে নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে টোলের মাধ্যমে শিক্ষাচর্চার ইতিহাস সর্বজনবিদিত একটি বিষয়। স্মৃতি, সংহিতা, সাংখ্য, ন্যায় ও দর্শন শিক্ষা ছিল সেই টোলগুলির মুখ্য পাঠ্যক্রম। সমস্তকিছু মিশিয়ে সেই সময় একজন ছাত্রকে জ্ঞান সঞ্চারের জন্যে পড়তে হয়েছে। মাণিকরাম গাঙ্গুলি লিখেছেন, -

“পঞ্চম বৎসরে যবে হইল বয়স।

বিদ্যারস্ত্রে উক্ত কৈল অপূর্ব দিবস।।

নিবাস নগরে নরোত্তম নামধেয়।

সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সকলের পূজনীয়।।”^৩

মধ্যযুগে শিক্ষাদানের যে প্রচলিত ধরন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতে সবিস্তারে পাওয়া যায়— তবে সেখানে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখ নেই। পাশাপাশি মধ্যযুগে অন্যান্য গ্রন্থ যেমন বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’ ও অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় নিলে দেখা যায়— বার ফলা শিক্ষা ও অক্ষর শিক্ষা দিয়ে বিদ্যারস্ত্র হয়েছে। এমনকি কৃষ্ণদাস কবিরাজ হাতে খড়ি দিয়েই বাল্যশিক্ষা সূচিত করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘সংস্কৃত শিক্ষা’ প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছেন উনিশ শতকের শিক্ষাগ্রহণপর্বের পদ্ধতি। সেখানে লিপিবদ্ধ আছে ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যারস্ত্র হত এবং অমরকোষ, কাব্য, ন্যায়শাস্ত্র দিয়ে কাব্য-নাটক পাঠের চর্চা শুরু করার চল ছিল। বিভিন্ন ভাষাশিক্ষা, আইন আদালতের প্রয়োজনে আইন বিষয়ে পড়াশুনা তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের প্রচলিত প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি, আরবি, ফারসি ভীষণ গুরুত্বের সঙ্গে চর্চা করার প্রথা ছিল। গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থেরা বা জমিদারগণ চণ্ডীমণ্ডপ, মসজিদ টোল প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাচর্চার স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে স্থান ও সংস্থান দুটোই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

পাঠশালার যখন চল বাংলাদেশে প্রচলিত হল, তখন সেখানে ধর্মশিক্ষার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেওয়ার রীতি লক্ষ করা যায়। কোম্পানীর শাসনকালে সেই ধারা অব্যাহত ছিল। কোম্পানীর প্রয়োজনে মিশনারিগণের সুবিধার্থে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে চারটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। পলাশির যুদ্ধের পর পলিসিগত পরিবর্তনশীলতার কারণে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাচর্চার আমূল পরিবর্তন হয়। একের পর এক কলেজ স্থাপিত হয়। সেই সূত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হয়, ১৮২০ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের অভিজাত, নব্যাবাবু ও জমিদার সম্প্রদায়ের রুচির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন প্রিন্স দ্বারকানাথের সুনাম এবং প্রতিষ্ঠা দুই শীর্ষস্থানে। বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই পরিবারকে সম্মান প্রদর্শন না করে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের কেন্দ্রমূলে আছে আমাদের দেশজ শিক্ষাব্যবস্থার চিরকালীন সনাতনী প্রথার রূপ ও পরম্পরা। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কাব্যে তপোবনের প্রভাব পড়েছিল অনুকূল ক্ষেত্রে হিসেবেই। ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ প্রবন্ধে বলেছেন—

“অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইন্সকুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা।”^৪

প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থেই আছে তথাকথিত একটি ‘তত্ত্বের’ প্রথর ও তীব্র বিরুদ্ধকথা বা প্রতিবাদ। যেমন তিনি খুব সাধারণ একটি বই ‘ইংরেজি সহজ শিক্ষা’-র ভূমিকায় বলেছেন—

“মুখস্থ করাইয়া শিক্ষা দেওয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। শব্দ ও বাক্যগুলি নানা প্রকারে বার বার ব্যবহারের দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা অগ্রসর হইতে থাকিবে, ইহাই লেখকের অভিপ্রায়। শব্দগুলি বোর্ডে লিখিত থাকিবে, ছাত্ররা তাহাই দেখিয়া মুখে ও লেখায় বাক্য-রচনা অভ্যাস করিবে...”।”

বাংলা শিক্ষাজগতের প্রকৌশলের একটি সচেতন পরিসর তিনি নির্মাণ করেছিলেন, যা বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

সমকালের মেয়েরা শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাগ্রহণের কর্মযজ্ঞ থেকে সবসময় দূরেই অবস্থান করতেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ‘স্মৃতিকথা’-য় জানিয়েছেন, তাঁর মা একদিন রাত্রে কিছু লেখাপড়া করছিলেন। অকস্মাৎ মেয়ে দেখে ফেলায় পাছে কাউকে বলে দেয়— এই ভয়েই সর্বদা কাতর ছিলেন। যাঁরা বয়স্কা প্রতিবেশিনী তাঁরাও লোকনিন্দার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে হিসেব-কেতাব চিঠিপত্র লিখতেন। সেকালে পাঠাশালা মানেই ছিল একটি ভয়ংকর রকমের আবহ। মারধোর, শাস্তি ছিল খুব সাধারণ বিষয়। যে যত বড়ো হাঁ করতে পারে সেই মাপের কণ্ঠ কেটে মুখে আটকে রাখা হত, কেউ গরহাজির হলে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসে বেত্রাঘাত প্রয়োগের বিশেষ আয়োজন ছিল। তবে গুরুভেদে অভিনব কায়দা প্রচলিত ছিল।

বাল্যকাল থেকে কলকাতার পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছেন, তাই বাধ্য হয়েই তিনি কলকাতারই একাধিক বিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। শৈশবে বিদ্যালয়ের দিনগুলি শিশুমনকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করতে থাকে; অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে চাপা পড়ে গিয়েছিল শৈশবের দিনগুলি। সুকুমার প্রাণগুলি স্বেচ্ছাবিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন শিক্ষা যদি আন্তরিক না হয় তাহলে তা সমূলেই বৃথা। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশি। শান্তিনিকেতনে তপোবনের আদর্শে নিজের চিন্তা ও ভাবধারাকে মিশিয়ে শিক্ষা সংস্কারের কাজে বাস্তবায়িত করতেই নানান অভিনব পথ অবলম্বন করেছিলেন। দশ বছর বয়সে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রের কাছে কক্ষাল সহযোগে অস্থিবিদ্যা ও শরীরবিদ্যার আয়োজন চলেছে। একদিকে শরীরচর্চা (কুস্তি, লাঠি খেলা ও সাঁতার কাটা) অন্যদিকে সংগীতচর্চা সব মিলিয়ে জীবনটা পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন মহর্ষি। ভোরে উঠে হিরা সিং নামে এক শিখ পালায়ানের কাছে লগ্নোটি পরে কুস্তি করতেন। এইভাবে সবদিক থেকে শিক্ষাপর্বটি ছিল দেশজ ও ব্যবহারিক শিক্ষাচর্চায় সমৃদ্ধ।

৩

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে মনে হয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’ ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে। তবে এক্ষেত্রে বলে রাখতে হয়, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ শিশুদের উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে রচিত কোনো পাঠ্য গ্রন্থ নয়। এইটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ সিভিলিয়ানদের উদ্দেশ্যেই রচিত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মদনমোহন স্কুলস্তরের শিশুদের শিক্ষাদানের সমস্যা নিরসনে ‘শিশুশিক্ষা’ রচনা করেন। বিদ্যাসাগর ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতের পদে যোগদানের পরে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়োজন মনে করেন। সেই সময় তিনি ‘বঙ্গালার ইতিহাস’ রচনা করেন। ১৮৫১ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ গ্রন্থের প্রচলন করেন এবং একই সঙ্গে ‘ঋজুপাঠ’ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৪৮ সালে ‘ইতিহাসমালা’ ও ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ‘জীবনচরিত’ রচনা করেন। ১৮৫১ সালে ‘বোধোদয়’ ও ‘কথামালা’ প্রকাশ করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, শিশুদের উপযোগী একটি গ্রন্থ রচনা করা প্রয়োজন এবং সেই স্থান থেকেই ‘বর্ণপরিচয়’ (১ম ভাগ - এপ্রিল ১৮৫৫, ২য় ভাগ - জুন, ১৮৫৫ খ্রি:) প্রকাশ করেন। স্কুল স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি, প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তকে রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় যতগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে শেষ গ্রন্থটি ‘চরিতাবলী’ ১৮৫৬ সালে প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু পূর্বেই মহর্ষি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করে ‘ভূগোল’ (১৮৪১ খ্রি:) গ্রন্থটি রচনা করেন। আমরা সকলেই জানি ১৮৪৩ সালে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ প্রকাশিত হয় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের দক্ষতায় এই পত্রিকার মান যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তীকালে ১৮৫৩ সালে ‘চারুপাঠ’ (১ম ভাগ - ১৮৫৩ সালে, ২য় ভাগ - ১৮৫৪ খ্রি: এবং ৩য় ভাগ - ১৮৫৯ সালে) ‘পদার্থবিদ্যা’ (১৮৫৬) রচনা করেন। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের ছাব্বিশ পৃষ্ঠার ‘শিশুপাঠ’ গ্রন্থটি এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কালীচরণ অধিকারীর ‘কবিতা-কলাপ’ গ্রন্থটি কোন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক তার উল্লেখ না থাকলেও ১৮টি কবিতা সম্বলিত গ্রন্থটি এই পূর্বেই রচিত। রামধামাধব মিত্রের ‘কবিতাবলী’-র কথা এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। ‘আর্যদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রতিভাধর ছাত্র ও আজীবন সাহিত্যসেবা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন ‘নবধারাপাত’, ‘শিক্ষাসোপান’, ‘শিশুপাঠ’, ‘জ্ঞানসোপান’ প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণতা দান করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যে পাঠ্যপুস্তক ‘সহজপাঠ’ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে।

শৈশবশিক্ষা : রবীন্দ্রনাথের শৈশবশিক্ষার সূত্রপাত হয় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে (তিন বছর দশ মাস বয়সে)। সেই সময়ে ঠাকুরবাড়ি ও পরিবারে দ্বারকানাথের দ্বারা প্রবর্তিত রীতিনীতি ও লৌকিকতার অনেকাংশই লুপ্ত হয়ে গেছে। সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে ইচ্ছে মতো চলার স্বাধীনতা মহর্ষি পুত্রদের দিতে পেরেছিলেন। একান্ত নিজস্ব মতামত প্রকাশ করতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে খুব একটা বাধার মুখে পড়তে হয়নি অগ্রজদের। সুনির্দিষ্ট মত ও পথ তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। জীবনযাত্রা ও চিন্তাপ্রণালীর পথে মানুষের প্রতিভা একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক ঐতিহ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বড়ো হননি। দাদা দিদিদের কাছে যে সুযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই অবকাশ ও পরিসর ছিল না। সুতরাং তিনি জন্মের পর থেকে ঠাকুরবাড়িকে একটি মধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন গৃহস্থ ছেলের মতোই বেড়ে উঠেছিলেন। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

“পাঁচবৎসরের পূর্বেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়; কিন্তু ঠাকুর বাড়ীর প্রথা ও বঙ্গদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে শুভদিন দেখিয়া বাগদেবীর অর্চনাপূর্বক বালককে হাতে খড়ি ধরান হয় নাই। অন্য কোনও প্রকার অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানও এই উপলক্ষ্যকে জয়যুক্ত করে নাই। তবে বাড়ীর পাঠশালাতে পরিবারস্থ অন্যান্য বালকদের সহিত গুরুমশায়ের নিকট রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত লিখন পঠনের সূত্রপাত হয়।”^৫

তখনকার কালের রীতি অনুসারে সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে একটি পাঠশালা থাকত। ঠাকুরবাড়িতেও সেই আসর বসত। শুরুটা হয় মাতৃভাষা শিক্ষার মধ্যে দিয়েই— বিদ্যাসাগরের-‘বর্ণপরিচয়’, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের— ‘শিশুশিক্ষা’, শুভঙ্কর দাস পণ্ডিত প্রণীত— ‘শিশুবোধক’ প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই। আমরা জেনেছি তিনজন বালক একত্রে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দলছুট ব্যক্তিত্ব। বর্ণপরিচয় দিয়ে হাতে খড়ির হয়। ‘কর’, ‘খল’, প্রভৃতি বানানের পরে যেদিন পড়েছিলেন “জল পড়ে পাতা নড়ে” সেইদিন কবির মনে হয়েছিল ‘আদি কবির প্রথম কবিতা’। তিনি সেদিন অনুভব করেন কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা আসলেই কোথায়! এই মিল আছে বলেই কথাগুলি মনের মধ্যে গেঁথে যায়, তাই তো কথাটা শেষ হয়ে গেলেও সুরটা শেষ হয়না। পাশাপাশি আরও একটি স্মৃতির কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, সেইটি হল— “বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান! ওই ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।”

রবীন্দ্রনাথ নিজে বাঁধা বরাদ্দ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে জীবনের শুরু করেননি। বরং ছাঁচে ঢালা মানুষকে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি থেকে দূরে সরে গিয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহার প্রাবল্যে মানসিক উন্নতিসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। মানুষের জীবনের সর্বাস্থান বিকাশসাধনের এক এবং একমাত্র উপায় হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছেন শিক্ষার গুরুত্বের প্রসঙ্গটি। সমস্ত সমস্যার সমাধানের মূলে আছে শিক্ষা। যে কারণে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক

লিখন, ও নানাবিধ শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাকে আমাদের বাহন করে নেওয়ার অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আজীবন। বাল্যকালে শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার সংকীর্ণতা ও দৈন্যদশা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন বেশি। তাই তো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে একটি সমান্তরাল বিকল্প মন গড়ে ওঠে। আর এই বিকল্প ব্যবস্থার উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে তিনি আজও বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনে সমস্ত উপকরণের মাঝে আজও বেঁচে আছেন। প্রকৃতির সাহচর্য ও মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের ইশারা পেয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলেছিলেন ১ম ধাপে আশ্রমিক বিদ্যালয় ও পরে শ্রীনিকেতনের মত পল্লীবাংলার রূপক প্রতিষ্ঠান। তাই তিনি উপলব্ধি করেন সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারাই সত্য সাধনা সম্ভব।

ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি : কান্নার জোড়ে ‘ওরিয়েন্টাল সেমিনারি’-তে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৬৫ খ্রিঃ। অর্থাৎ গরানহাটার গোরাচাঁদ বসাকের গৌরমোহন আচ্যের স্কুলে। এটিই ছিল কবির প্রথম স্কুল এবং তখন কবির বয়স ছিল তিন বছর দশ মাস। ১৮৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন কবি ভর্তি হন। শুরুর দিকে এই শিক্ষাক্ষেত্রের নাম ছিল ‘মেট্রোপলিটান ট্রেনিং স্কুল’। পরে নাম হয় ‘ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি’। এখানে কী ধরনের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা মনে না থাকলেও শাসনপ্রণালীর কথা বেশ স্মরণে ছিল। তাই স্কুলের শাসননীতির হীনতা মোচনে তিনি বারান্দায় স্কুল খুলেছিলেন। রেলিংগুলির মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যাপারে অবিচারের প্রতীক নির্মাণ করে পক্ষপাতপরতার তীব্র শানিত আক্রমণ করেছেন। সংকীর্ণতার চূড়ান্ত নিদর্শনের বিরোধিতা এইভাবে করেছিলেন সেই দিন। সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথাসূত্রে জানা যায় এই সময় গৃহশিক্ষক ছিলেন সেই স্কুলের শিক্ষক ঈশানচন্দ্র নন্দী। চাণক্যক্লোক ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদের গ্রন্থ দিয়েই সেই সময় শুরু হয়েছিল পড়াশুনা। যাই হোক এখানে পড়াশুনার অভিজ্ঞতা মোটেই ভালো ছিল না।

নর্মাল স্কুল : পরবর্তীকালে ‘নর্মাল স্কুল’ বা ‘গভর্নমেন্ট পাঠশালা’ পর্বটি শুরু হয় ১৮৬৬ সালে। ১৮৬৬ সালের শেষে বা জানুয়ারি মাসে অথবা ১৮৬৭ সালে শুরুর দিকে তিনি এখানে ভর্তি হন এবং ডিসেম্বর ১৮৭১ সাল পর্যন্ত, ছয় বছরের কিছু কাল কমবেশি এখানে পড়াশুনা করেন। ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সালে নর্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায় কিছুটা বেশি রকমের বাংলা শিখে যাওয়ার কারণে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দু’বছর পরে বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ও তৎপরতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় ১৭ জুলাই, ১৮৫৫ সালে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই স্কুলটি সেকালে ‘ক্যালকাটা গভর্নমেন্ট’ বা ‘ক্যালকাটা মডেল স্কুল’ নামেও পরিচিত ছিল। ইতিপূর্বে ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে পড়াশুনার অভিজ্ঞতা খুব স্বল্পদিনের। এই স্কুলজীবনের পর্বটিই রবীন্দ্র জীবনের সব থেকে দীর্ঘ। এই স্কুলের অভিজ্ঞতাও খুব সুখকর ছিল না। পূর্বের স্কুল পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করেছেন প্রশান্তকুমার পাল—

“হয়তো এই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি অভিভাবকদের ভালো লাগে নি অথবা ছোটো ছোটো শিশুদের পক্ষে জোড়াসাঁকো থেকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের দূরত্ব খুবই বেশি মনে করা হয়েছিল, সেখানে নর্মাল স্কুল ছিল প্রায় বাড়ির পাশেই, যদিও যাতায়াতের জন্য ‘ইস্কুল গাড়ী’র বন্দোবস্ত ছিল।”^৬

তিনি একটি আনুমানিক কথা জানিয়েছেন যে, এই সময় রবীন্দ্রনাথ ‘বর্ণ পরিচয়’ (২য়), ‘ধারাপাত’, ‘মানসাক্ষ’ (প্রণেতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করে থাকবেন।

এই স্কুলের অভিজ্ঞতা শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন শিশু রবীন্দ্রনাথ। ‘জীবনস্মৃতি’তে আছে—

“অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। ... শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।”^৭

এই স্কুলের কর্তৃপক্ষের গায়ে পড়া থিয়োরি শিশুর তখন পছন্দ হয়নি। তাঁরা মনে করতেন স্কুল যে বিষয়টি স্থির করেছে সেই বিষয়টিতেই সকলের মঙ্গল। এই ভাবনাটি শিশুমনে আঘাত করে। এই স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষালের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত বাংলা, গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের মত গ্রন্থ পাঠ করতেন।

বেঙ্গল একাডেমি (ফিরিঙ্গি স্কুল) : নর্মাল স্কুলে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ছয় বছর কাটিয়ে আবার তিনি স্কুল পরিবর্তন করেন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। এই স্কুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এখানে বালক রবীন্দ্রনাথ ফাঁকি দিতে সুযোগ পেতেন বেশি। এখানে পড়া না পারলেও মারপিট কম হত। এই বেঙ্গল একাডেমি স্কুলে পড়াকালীন তাঁর উপনয়ন হয়। এই স্কুলে থাকাকালীন তিনি প্রায়ই বাড়ি পালিয়ে আসতেন— অবশ্য এই ব্যাপারে অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগ্নে সভ্যপ্রসাদ সাহায্য করতেন। পাঠ্যতালিকার পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া গেলেও লাতিন পড়ানোর কথা শোনা যায়। এই সময় বাড়িতে নীলকমল ঘোষাল বাংলা পড়াতেন না, তবে অঘোরবাবুর^৮ কথাও শোনা যায়।

তাই পড়াশুনায় খুব বেশি চাপাচাপির ব্যাপার ছিল না। উপনয়নের পর কিছুদিন বোলপুরে কাটিয়ে মাস তিনেকের জন্যে অমৃতসরে কাটান। এই পর্বে দুই ট্রান্স ভর্তি বই গিয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ছিল— ভাগবতগীতা, বিদ্যাসাগর মশায়ের ‘সংস্কৃত উপক্রমণিকা’, ‘ঋজুপাঠ’ (২য় ভাগ), ‘Peter Parley’s Tales, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের জীবনচরিত, এছাড়া সহজপাঠ্য কিছু ইংরেজি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বই প্রভৃতি। এই সমস্ত গ্রন্থের কথা পূর্বেই বিস্তৃত আকারে বলা হয়েছে। বেঙ্গল একাডেমি ত্যাগের পরে কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে পাঠ্য-তালিকায় ছিল পোয়েটিকল-সিলেকশন্, হিলির গ্রামার, পাঠ্যমালা, ম্যাকবেথ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থ। তবে সেখানেও বালক রবীন্দ্রনাথকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। স্কুলজীবন এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তবে তিনি স্কুলের বাইরে গৃহশিক্ষকদের সান্নিধ্য ও শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বেশি মাত্রায়। শুধু গৃহশিক্ষকদের কথাই নয়; তার পাশাপাশি বাড়ির চাকর মহলের অনেকেই গুরুমশায়ের স্থান পেতে পারে। এইরকম একজন ছিলেন অত্যন্ত শুচিসংযত ও আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ ও গভীর প্রকৃতির মানুষ— তিনি ছিলেন ঈশ্বর। কখন পরস্পরের ধারাবাহিক চর্চা ও প্রথা ঠাকুরবাড়িতেও অব্যাহত ছিল। এই ঈশ্বর শিশুদের হট্টগোল নিবারণের জন্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনাতেন। সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলে ভাঙা সেজবাতির চারিদিকে সকলে বসে রামায়ণ ও মহাভারতে গল্প শুনতেন। ক্ষীণ আলোকে কেমন পরিমণ্ডল গড়ে উঠত তার বিস্তৃত বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন। শিশুমনে গল্প শোনার পরিসর পূর্ণ করতেই মাঝে মাঝে পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে এসে ‘দাশরায়ের পাঁচালি’ শুনিয়ে যেতেন। মা সারদা দেবী সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন সংসারের কাজে। তাই চাকরদের শাসনে দিন কাটত তাঁর। সেখানে ‘শ্যাম’-এর পাশাপাশি ঠাকুরবাড়ির অত্যন্ত সংযত আচারনিষ্ঠ কর্মচারী ব্রজেশ্বর ছিলেন গ্রামের গুরুমশাই। তিনিও খুব সুন্দর করে ‘রাজপুত্র’ গল্প শোনাতেন।

গৃহশিক্ষকদের মধ্যে দু’একজনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাড়িতে যে দু’জন শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হেরস্ব তর্করত্ন,^৯ আর অন্যজন হরিনাথ ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য রামসর্বস্ব বিদ্যভূষণ। তিনি অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণমনস্ক করতে চেয়েছিলেন। অর্থব্যখ্যা করে ‘শকুন্তলা’ নাটক পড়াতেন।

স্কুলের পড়াশুনার ব্যতিরেকে পরিবারের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বাংলা ভাষার পাঠ গ্রহণ করতেন নিয়মিত। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর ‘স্মৃতিকথা’-য় আছে –

“বিয়ের পরে আমার সেজদেওর হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। তাঁর শেখাবার দিকে খুব ঝোঁক ছিল। নিজের মেয়েদেরও সব লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম আর এক একবার ধমক দিলে চমকে উঠতুম। ... আমার যা কিছু বাংলা বিদ্যা তা সেজঠাকুরপোর কাছে পড়ে।”^{১০}

নিজের জীবন দিয়ে তিনি ‘ভয়ংকর মাস্টারির’ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা ভীষণ কষ্টকর ছিল। বাংলার শিক্ষক মধুসূদন বাচস্পতির কাছে শেষ বেঞ্চে বসে থাকা ছাত্রের বেশি নম্বর পেয়ে যাওয়া তাঁদের কাছে এমনকি অন্যান্য শিক্ষকদেরও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। চারদেওয়ালের মধ্যে শিক্ষকদের এই ক্ষুদ্রতা ও কদর্যতা বালক মনে গভীর রেখাপাত

করেছিল। তার উপর ছিল শিক্ষার ভয়ংকর রকমের একঘেয়েমি, শিক্ষকদের পক্ষপাত ও দুর্ব্যবহার শিশুমনে যে প্রভাব ফেলেছিল তা তিনি পরবর্তীকালে অকপটে স্বীকার করেছেন।

8

শিক্ষাচিন্তার ভিত্তিভূমি : রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের স্বল্পস্থায়ী স্কুলজীবনের অভিজ্ঞতা ও বাল্যস্মৃতি পরবর্তী শিক্ষাসম্পর্কিত শৃঙ্খলাপারায়ণ অভিব্যক্তির প্রধান ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাতন্ত্রের অনুসরণকারী কৃত্তিম শিক্ষাবিধির পরিবর্তে যথালোচিত ও যথাভিপ্রেত আদর্শ রূপ তাঁর যুক্তিপ্রাথের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাণহীন আনন্দহীন বিড়ম্বনা একজন শিশুকে কীভাবে গৃহশিক্ষক বিমুখ করে তোলে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ শিশু রবীন্দ্রনাথ নিজেই। মর্মে মর্মে নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন আনন্দ ও মুক্তির বাণী। প্রচলিত ইংরেজ-প্রবর্তিত পথ পরিত্যাগ করে ও দেশজ পদ্ধতিতে আশ্রমলালিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আমাদের জাতীয় জীবনে সবথেকে বড়ো সংকট তৈরি হয় অশিক্ষার কারণেই, তাই এই শিক্ষাকে জাতীয় তথা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতেই বিশ্বভারতীর (যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম) বেদী স্থাপনা। ২২ ডিসেম্বর ১৯২১ (৮ পৌষ ১৩২৮) ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে জমি জায়গা, সম্পদ, বাড়ি-ঘর এমনকি নিজেকে সকলের জন্যে সমর্পিত প্রাণরূপে মেলে ধরেন।

শিলাইদহে থাকাকালীন ছেলে মেয়েদের শিক্ষার কথা ভেবে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা খুব জরুরি বিষয় হয়ে পড়েছিল। গৃহশিক্ষার দ্বারা শিক্ষাগ্রহণের পরিপূর্ণতা আসে না তা তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। পাশাপাশি একটি আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলার অভীক্ষা থেকে শান্তিনিকেতন পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয় ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ২২ নভেম্বর। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় প্রভৃতি কয়েকজন অধ্যাপক ও পাঁচজন ছাত্র— রথীন্দ্রনাথ, সুধীরচন্দ্র নান, প্রেমকুমার গুপ্ত, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ও অশোককুমার গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। ইতিপূর্বে শিলাইদহে গৃহ-বিদ্যালয় স্থাপন করে কাজ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত। শিক্ষাকে কেন্দ্র তিনি যে কাজ করেছেন শুধু সেই কর্মযজ্ঞের জন্যেই তিনি সমকালে ও পরকালে বিখ্যাত হতে পারতেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। শিক্ষাচিন্তা, নিজস্ব শিক্ষাবিধি, শিক্ষার ভবিষ্যৎচিন্তা ও ভবিষ্যৎ-দর্শন মানুষের সর্বাঙ্গীন জীবন গঠনের প্রধান সহায়ক হয়ে উঠেছিল। তপোবন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মবিদ্যালয়কে জগতের সম্মুখে তুলে ধরেন। বীরভূমে গাছপালা মুক্ত বায়ুর মুক্তচিন্তার আদর্শ ক্ষেত্র নির্মাণ করেন। শিক্ষা ও জীবনে চিন্তার সংকীর্ণতা পরিপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে মুক্ত বাতায়নে মুক্ত চিন্তার সাধনা শুরু করেছিলেন। শিক্ষা শুধু উপার্জনের উপায় নয়; সত্য উপলব্ধির প্রধান পথ তিনি বারংবার উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। সর্বশিক্ষার সর্বজনের মিলনে যা সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চেতনালোকের ভিত্তিভূমি গড়ে ওঠে শৈশবের পারিবারিক রুচিসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। শিশু-কিশোর বয়স থেকে সংস্কৃত কাব্যপাঠের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দেখতে গেলে দেখা যায়, সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের দিকে ঝুঁকে গিয়ে কাব্যপাঠের প্রতি শিশুমনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হননি; কিন্তু বাংলা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বলে কুমারসম্ভব তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ও তিনটি স্বর্গ মুখস্থও হয়ে গিয়েছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : শিক্ষার জন্যে ভাষার গুরুত্ব সর্বাধিক। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের পক্ষে তিনি বারংবার পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলা ভাষাকে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ যখন ঠেলা দিয়ে অন্দরমহলের দিকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তখন ঠাকুরবাড়িতে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর। এই পরিবারের পুরুষ ও মেয়েদের চালচলন ও বেশভূষাতেও ছিল বিশেষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। এই পরিবেশে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে সাবলীলভাবে। তিনি স্বীকার করেছেন যে, -

“আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাকপৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।”^{১১}

পিতৃদেবের সাহচর্যে বৈদিক সাহিত্য থেকে নির্বাচিত মন্ত্রের উচ্চারণ শিশুমনে ও পরবর্তীকালে মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জাগরিত করে তুলেছিল। হিমালয় বাসকালে রবীন্দ্রনাথ গীতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

স্বদেশপ্ৰীতির হাওয়া : বাংলার আকাশে বাতাসে যখন স্বাধীনতার জোয়ার তখন দেশপ্ৰীতি ও স্বদেশভাবনার পথ প্রশস্ত ছিল ঠাকুরবাড়িতে। হিন্দু মেলার প্রতি বাড়ির অগ্রজদের আগ্রহ ও মেজদাদার লেখা ‘জয় ভারতের জয়’ গান স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল শিশু রবীন্দ্রনাথকে। ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা যেন তিনি পেয়েছিলেন এই পারিবারিক গণ্ডিতেই। জ্যোতিদাদা যাঁকে রবীন্দ্রনাথ সকলের চেয়ে বেশি মানতেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করলেন স্কুলছুট শিশু। বাইরে থেকে তিনি শিশুমনকে কখনও বাঁধন পরান নি।

ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যয়নে অঘোরবাবুর পাশাপাশি ছিলেন রাখালদাস দত্ত মহাশয়। তবে অঘোরবাবু চার বছর ইংরেজি পড়িয়েছিলেন। এই সূত্রে বলে নেওয়া যেতে পারে প্রথমবার বিলাত ভ্রমণের পূর্বে তিনি ইংরেজি বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন পাণ্ডুরঙের বাড়িতে আল্লা তরখড়ের সহায়তায়।

কথাশেষ : রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— “আমি ধনের মধ্যে জান্‌মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।” শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদান-প্রণালী রবীন্দ্রজীবনের সাধনার দু’টি বিশেষ অধ্যায়। বিদেশিদের শাসনের মধ্যে জীবনযাপন করেও বিদেশাভিমুখিতা পরিত্যাগ করে ভাষাশিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করে চরিত্রগঠন ও জীবনচর্যার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বা উপযোগী করে বেশ কিছু পদক্ষেপ ও অভিনব কায়দা উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাগ্রহী চৈতন্যলোকের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। গণ্ডীবন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবন এবং জগৎকে সংস্কৃতিসম্পন্ন করে গড়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব ছিল। দেশজ চিন্তকে সদাজাগ্রত রেখে শিক্ষাগ্রহণ করার পক্ষেই সবসময় রায় দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছেন—

“দেশের চিন্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ—শিক্ষায় পরধর্ম।”^{১২}

‘মনুষ্যত্বের’ পরিপূর্ণতা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিক্ষকের শৈশবে পেয়েছেন তাঁদের তিনি শিক্ষা নামক কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। শিক্ষাদানের এই গুরুত্ব তাৎপর্য অপরিসীম। আমাদের প্রচলিত ধারণা হল, -

“ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া খারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্ক পড়িয়া যায়।”^{১৩}

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৭
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনিবর্তন, ১৩৭৫, পৃ. ৫৭
৩. দত্ত, বিজিতকুমার (সম্পাদিত) মানিকরাম গাঙ্গুলির বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০, পৃ. ১১৪
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (১১ খণ্ড), প. ব. সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ৭২৩
৫. চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-কথা, জয়শ্রী পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৩৪৮, পৃ. ১৬৩

৬. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী (১ম খণ্ড), পৃ. ৭০
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২৬
৮. “অঘোরবাবু নিতান্তই যে কঠোর মাস্টারমশাই-জাতের মানুষ ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। ...কিন্তু তিনি যত ভালো-মানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি।” তাঁর সম্পর্কে আরও বলেছিলেন অঘোরবাবু মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই মেডিকেল কলেজের ‘ছাত্রমশায়দের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অন্যায্যরূপে ভালো ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বেও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৩১
৯. জীবনস্মৃতিতে আছে— “হেরস্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদের একেবারে ‘মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং’ হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাইতে শুরু করিয়া দিলেন।” ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, পৃ. ২১
১০. দেবী, ইন্দিরা, পুরাতনী, রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯১৮, পৃ. ২৭
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫২, পৃ. ৮৬
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ. ২৯১
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৪৮